দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানপথ ও বিচারপথ -- ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার, ২রা জানুয়ারি, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। ঘরে রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ প্রভুসঙ্গে একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি) -- বেশি বিচার করা ভাল না। আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ -- তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাখালের প্রতি) -- "যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ি, বাগান, কোম্পানির কাগজ, সব জানতে পারা যায়।

"তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বললেন।

"ওর একটু মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ -- আগে ঈশ্বর, তারপরে জগৎ।"

[*কৃষ্ণকিশোরের সহিত 'মরা' মন্ত্রকথা*]

"কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা' 'মরা' শুদ্ধ মন্ত্র -- ঋষি দিয়েছেন বলে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ।

"তাই আগে বাল্মীকির মতো সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বরদর্শন! তারপর বিচার -- শাস্ত্র, জগৎ।"

[*ঠাকুরের রাস্তায় ক্রন্দন -- "মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও" -- ১৮৬৮*]

(মণির প্রতি) -- "তাই তোমাকে বলছি, -- আর বিচার করো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ওই কথা বলতে। বেশি বিচার করলে শেষে হানি হয়। শেষে হাজরার মতো হয়ে যাবে। আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম আর বলেছিলাম --

'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

"বল, আর (বিচার) করবে না?"

মণি -- আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা

ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

“তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও-দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি একজন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।”

[*পদ্মলোচনের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি -- পঞ্চবটীতে সাধনকালে প্রার্থনা*]

“তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড়কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়িতে যাব, তার আর কি? -- তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি!’

“ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতির কাছে কার্তিক আর গণেশ বসেছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বললেন, ‘যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, তাকে এই মালা দিব।’ কার্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না করে ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আস্তে মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করিলেন। গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রসন্না হয়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ পরে কার্তিক এসে দেখে যে, দাদা হার পরে বসে আছে।

“মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, ‘মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও -- পুরাণ তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও।’ তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

“তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন, -- কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।”

[*সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন -- শিব-শক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দ-সাগর*]

“একদিন দেখালেন, চর্তুদিকে শিব আর শক্তি। শিব-শক্তির রমণ। মানুষ, জীবজন্তু, তরুলতা, সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি -- পুরুষ আর প্রকৃতি। এদের রমণ।

“আর-একদিন দেখালেন -- নৃমুণ্ডস্তূপাকার! -- পর্বতাকার! আর কিছুই নাই! -- আমি তার মধ্যে একলা বসে!

“আর-একবার দেখালেন মহাসমুদ্র! আমি লবণ-পুত্তলিকা হয়ে মাপতে যাচ্ছি! মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম! -- দেখলাম জাহাজ একখানা; -- অমনি উঠে পড়লাম! -- গুরু কর্ণধার! (মণির প্রতি) সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ তো সকালে ডাকো?”

মণি -- আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- গুরু কর্ণধার। তখন দেখছি, আমি একটি, তুমি একটি। আবার লাফ দিয়ে পড়ে মীন হলাম। সচ্চিদানন্দ-সাগরে আনন্দে বেড়াচ্চি দেখলাম।

“এ-সব অতি গুহ্যকথা! বিচার করে কি বুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন সব পাওয়া যায় -- কিছুরই অভাব থাকে না।”